International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 20-26
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.176

মনোজ বসুর গল্পে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী উচ্চারণ

ড. মৌসুমী পাত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 21.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Manoj Basu is a famous fiction writer in Bengali literature. He witnessed the partition of the country on the basis of religion and the resulting communal riots between Hindus and Muslims. The breakdown of the long-standing coexistence and cordial relationship between Hindus and Muslims hurt the writer-artist Manoj Basu. He could not accept Hindus and Muslims as opposing forces. Therefore, he repeatedly wrote against this human disunity and spoke about Hindu-Muslim unity. Even in the midst of the riots, when the hatred between Hindus and Muslims has reached its peak, the writer Manoj Basu has emphasized the mutual love between these two communities. This is reflected significantly in the stories 'Yasin Mian', 'Bande Mataram', 'Tanter Maku', 'Manush', 'Dangar Ekti Kahini', 'Dangar Dag', 'Hindu-Musalman', 'Hindu-Muslim Danga', 'Balidan', 'Simanta', 'Epar-Opar', etc. In this article, we have discussed all these stories in detail and sought to explore the non-communal humane sentiments of the poet Manoj Basu.

Keywords: Manoj Basu, Anti-communal, Hindu-Muslim, Affection, Harmony

মনোজ বসু ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তিনি ১৯০১ সালে ২৫ শে জুলাই অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর থানার ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব কল্লোল পত্রিকায় একটি কবিতা রচনার মাধ্যমে কিন্তু চরিত্র ধর্মে মনোজ বসু কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি কল্লোলের নাগরিকতা থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ পল্লীপ্রেমিক। মানুষ ও পল্লীপ্রীতি তাঁর রচনার ভিত্তি। গ্রামের সহজ সরল মানুষ, মানুষের অন্তরের স্নেহ-প্রেম-মমতা-ভালোবাসা এবং মানুষের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু গল্প রচনা করেছিলেন। পল্লীপ্রেমের পাশাপাশি মনোজ বসুর শিল্পী-মন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ১৯৪৭-র ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দ্বন্দ্ব-বিরোধ তাঁকে প্রভাবিত করে। দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণ, হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ তিনি মেনে নিতে পারেননি। দুই সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক একত্রে সহাবস্থান আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রভাবে ধ্বংসাত্মক বিবাদে রূপ নিলে তা তাঁর শিল্পী সত্তাকে আহত করে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন বিবাদ-বিরোধ পারস্পরিক অবজ্ঞা-অবিশ্বাস পরস্পরবিরোধী আচরণ তাঁকে পীড়িত করে। তাই গল্পকার মনোজ বসু এই মানবিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে বারবার লেখনী ধারণ করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা তথা মানবতার কথা বলেছেন। দাঙ্গা আক্রান্ত পরিস্থিতিতে যখন হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে তখনও শিল্পী মনোজ বসু দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন—যার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেছে 'ইয়াসিন মিঞা', 'বন্দে মাতরম', 'তাঁতের মাকু', 'মানুষ', 'দাঙ্গার একটি কাহিনী', 'দাঙ্গার দাগ', 'হিন্দু-

মুসলমান', 'হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা', 'বলিদান', 'সীমান্ত', 'এপার-ওপার' গল্পগুলোতে। এই গল্পগুলোতে মূলত গুরুত্ব পেয়েছে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মনোজ বসুর এই জাতীয় গল্পগুলো আলোচনা করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানবিক উচ্চারণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

বিভাগ পূর্বকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে লিখিত 'ইয়াসিন মিঞা' একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন গল্পটির আদ্যন্ত জুড়ে। পরস্পরবিরোধী দুই সম্প্রদায়ের মানুষের একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা নষ্ট হওয়া এবং পরে আবার সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার কথা রয়েছে এই গল্পে। গল্পের শুরুতে ইয়াসিনের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিরাগ, বিদ্বেষের কারণে একটি শিশুও তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। হিন্দুর সন্তান বলে শিশুটির প্রতি সে নির্মম নিষ্ঠুর। তাঁর কাছে জাত ভাই সবার আগে। তাই সে সাত বছরের একটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশুকন্যাকে ফুলুরির লোভ দেখায় কিন্তু দেয় না। এই প্রসঙ্গে তার নিষ্ঠুর উক্তি—

> "ঈস, শখ দেখে বাঁচি নে। ফুলুরি খাবেন! কুত্তার মতো তোমরা রুটি-মাখন ছিঁড়বে— ফুলুরি খেতে হলে কপাল করে আসতে হয়।"[1]

ভিন্ধর্মের একটি শিশুকন্যার প্রতি ইয়াসিনের এই নির্মম উক্তি থেকে তার ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষমূলক মনোভাবের পরিচয় সহজেই উপলব্ধ হয়। গল্পের অন্যান্য চরিত্র কাজী সাহেব, রজনীকান্ত সাঁপুই প্রত্যেকেই জাতি বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। গল্পের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বিদ্বেষের স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পরিণতিতে এসে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ নেই বরং ধনী দরিদ্রের মধ্যেই প্রকৃত ভেদাভেদ। যে কাজী সাহেবের কথাবার্তায় সবসময় হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাস ধরা পড়েছে, সেই তিনিই আবার স্বার্থরক্ষার তাগিদে জাতভাইকে অন্যায় শাস্তি দিয়ে হিন্দুর পক্ষ নিতে পিছপা হননি। ইয়াসিনের জাতভাই কাজী সাহেব তার অনুনয়ে সাড়া দেয়নি। দেখা গেছে তার ধর্ম তার অসহায়তার পাশে দাঁড়ায়নি বরং ভিনধর্মী সাধুচরণ তার পাশে দাঁড়িয়েছে। এই কষ্ট, যন্ত্রণায়, দারিদ্রতায়, অসহায়তায় সাধুচরণ ও ইয়াসিনের অবস্থান একই মেরুতে। এই যাপনে তাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তারা অভিন্ন। তাদের কষ্ট, যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ যেন একসুতোয় বাঁধা। অপরদিকে গরিব অসহায় শ্রমিক শ্রেণিকে প্রতারিত করার ক্ষেত্রেও বারিধি সেন তার স্ত্রী নন্দা, রজনীকান্ত, এবং ইয়াসিনের জাতভাই কাজী সাহেবের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই গল্পের শেষে ইয়াসিনের উপলব্ধি ভিনজাত সাধুচরণই প্রকৃতপক্ষে তার জাতভাই। এই সত্য উপলব্ধিকে লেখক পাঠকের মনের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন।

সমকালে রচিত মনোজ বসুর 'বন্দে মাতরম' গল্পটিও তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশে সমুজ্জ্বল। তাঁর গল্পে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকে পরস্পরবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে নয়, একে অপরের সহায়কশক্তি হিসেবেই তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। তিনি জানতেন হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সংঘর্ষ এদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং পরিপন্থী। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিবাদ আসলে ব্রিটিশদের উসকানি ও প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। এই সত্যটি আলোচ্য গল্পে নানা অনুষঙ্গ যেমন মুসলিম ধর্মাবলম্বী গহর আলির বীরুর মাকে 'মা ঠাকরুন' বলে সম্বোধন করা এবং বীরুর মায়ের সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে গহরের স্ত্রী পরীকে বুকে জড়িয়ে ধরা, গহরের বাল্যকালে পাঠশালায় মুড়ি-মোয়া কাড়াকাড়ি করে খাওয়া, একসাথে খেলাধূলো এছাড়া গঙ্গাচরণ সর্দারের গানের দলে গহরের ঢোল বাজাতে যাওয়া, বীরুর মায়ের গহর আলির পায়ের ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। গল্পে

সমকালে রচিত 'বন্দে মাতরম' গানটি মুসলিম ধর্মাবলম্বী গহরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বারবার। এর মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এই গানটি হিন্দু-মুসলিমসহ আপামর বাঙালির গান কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ এই গানটি সহজভাবে গ্রহণ করেননি। তবুও মুসলিম ধর্মাবলম্বী গহরের কণ্ঠে এই গান ধ্বনিত হবার মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়— এ এক আশাবাদ তথা সাম্প্রাদায়িকতার কঠিন আবর্তেও সম্প্রীতির, মানুষে মানুষে প্রাণ সম্মিলনের অভিব্যক্তি।

লেখকের 'তাঁতের মাকু' গল্পটিতে দেখা যায় দেশভাগের পর একটি পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তীতে নানান প্রতিকূলতায় নতুন দেশে মানিয়ে নিতে না পেরে পুনরায় ভিটের টানে ফিরে আসে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিন বসবাস করে আসা হিন্দু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়ে কী নিদারুণ যন্ত্রণায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে গল্প জুড়ে। এককালীন দাপটের সঙ্গে দিন কাটানো পরিবারের কর্তা দেশভাগের পর দীর্ঘদিনের চেনা মুসলিম প্রতিবেশীর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা ও নির্মমতায় প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে পরিবারের কর্তা অবশেষে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে। পথে চূড়ান্ত দুর্ভোগ ও হায়রানি সহ্য করে তিনি পৌঁছান দূর সম্পর্কের মামার বাড়িতে। যে মামাকে এককালে আপ্যায়নে ও আতিথেয়তায় আশ্রয় দিয়েছিল নিজের বাড়িতে সেই মামার বাড়িতে অতিশয় শীতল অভ্যর্থনা প্রাপ্তি এবং নতুন দেশে থাকা খাওয়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পেরে অসহায় কর্তা পুনরায় নিজের দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের তাঁতের মাকুর মতো অবস্থা হয় তাঁদের ওদিকের ধাক্কায় এদিকে আসা আবার এদিকের ধাক্কায় ওদিকে ফেরা। তাঁরা দেশের স্টেশনে নেমে অর্থের অভাবে বাড়ি অবধি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারেন না। এই অসহায় পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী সাবেদ শেখের সঙ্গে তাঁদের হঠাৎ দেখা হয় এবং প্রতিবেশী পূর্বেকার আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য। অবশেষে সেই মুসলিম প্রতিবেশী সবেদ শেখের গোরুর গাড়িতেই তাঁরা উঠে আসেন। পথে যেতে যেতে আর এক দুশ্চিন্তা তাঁদের গ্রাস করে কারণ তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ফেলে যাওয়া বসতবাড়ি ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না। একরকম ভয় ও আশঙ্কা থেকেই পরিবারের কর্তাটি, প্রতিবেশীর কাছে জানতে চান তাদের ফেলে যাওয়া বসতবাড়ি অন্যের দখলে চলে গেছে কিনা, সবেদ আশ্বাস দেয়—

"আমরা সকলে আছি তো ছোটবাবু।"[২]

—সংকটপূর্ণ সেই পরিস্থিতিতে ভিনধর্মী এক প্রতিবেশীর প্রতি সবেদের এই আশ্বাস তথা মানবিক আচরণের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। জাতিধর্ম ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে একজন মানুষের অসহায়তায় আর একজন প্রতিবেশীর সহায়তার এই আশ্বাস গল্পে উদার মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশকে উন্মোচিত করেছে।

মনোজ বসুর 'কাঁচের গল্পগ্রন্থের' অন্তর্গত 'মানুষ' গল্পে গল্পকথকের স্মৃতি চারণে মানবিক সম্প্রীতির কথা উঠে এসেছে। গল্পকথক জনৈক্য ব্যক্তি নিশিকান্তের কাছে তাঁর ফেলে আসা অতীতের গল্প করেছেন। যে অতীতে নিষ্ঠাবান হিন্দু অথবা নিষ্ঠাবান মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মীতা ঔদার্য্য ও ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না। কথক অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সময়ের তুলনা করে কাতর হয়েছেন কিন্তু হতাশ হন না। তিনি আশাবাদী সেই সুন্দর অতীত আবারও ফিরে আসবে মানবমৈত্রীর বার্তা নিয়ে। এই আশাবাদে লেখক পাঠক চিত্তকেও উদ্দীপ্ত করেন।

একই লেখকের আর একটি সাম্প্রদায়িকবিরোধী গল্প হল 'দাঙ্গার একটি কাহিনী'। গল্পের সূত্রপাত হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা দুই ভিন্নধর্মী অসমবয়সী মানুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। দুজনেই

কলকাতা শহরের উন্মত্ত, হিংস্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার। তাঁদের কথোপকথনের সূত্রে জানা যায় দুই ব্যক্তির বাড়ি প্রতিবেশী দুই গ্রামে। সেখানে তাঁদের সম্প্রীতির আনাগোনা ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঙ্গার নিষ্ঠুরতায় মুসলিম ছোকরা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, বৃদ্ধেরও চাকরি যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পরবর্তী ভবিষ্যতের চিন্তা দুজনকেই ভারাক্রান্ত করে। হিন্দু বৃদ্ধটি মাথা গোঁজার আশ্রয় অবধি নেই জেনে সহমর্মী মুসলিম তরুণ সহানুভূতির সঙ্গে বৃদ্ধকে তার গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানায় ধর্মীয় বিবেদ এখানে বাধা হতে পারেনি। অথচ গল্পের শেষে জানা যায় ঐ মুসলিম ছোকরাই হিন্দু বৃদ্ধকে রাতের অন্ধকারে ছুরির আঘাতে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর মাধ্যমে লেখক আমাদের যে উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেন তা হল—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আসলে উন্মত্ত হিংস্র নেশা যা ক্ষণিকের, চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী সম্পদ মানুষের অন্তরে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা।

মনোজ বসুর 'দাঙ্গার দাগ' গল্পটির সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত 'দাঙ্গার একটি কাহিনী' গল্পের আখ্যানগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। দুটি গল্পেই লেখক সময়ের পার্থক্যে মানুষের চরিত্রগত পরিবর্তন দেখিয়ে মানুষে মানুষে হিংসা-হানাহানি বিবাদ বিসম্বাদের নিরর্থকতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পে বেনোপোল স্টেশনে পূর্ব পাকিস্তানগামী ট্রেনের কামরায় দুই ভদ্র লোককে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখা যায়। একজন মুসলিম অপরজন হিন্দু। তাঁরা একদা কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরস্পর শত্রু হিসেবে মুখোমুখি হন। হিন্দু ভদ্রলোক আজিজের বস্তিতে আগুন লাগিয়েছিল এবং প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে পরের দিন আজিজ হিন্দু ভদ্রলোককে ছুরি মারে এবং দেশত্যাগ করে। বহুদিন পরে বেনাপোল স্টেশনে আবার তাঁদের দেখা কিন্তু তাঁদের চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। দাঙ্গার দাগ ঢাকতে হিন্দু ব্যক্তিটি দাঁড়ি রাখেন এবং বার্ধ্যক্যের চিহ্ন মুছতে আজিজ তার দাঁড়ি কেটে ফেলে। চেহারার সাথে সাথে তাদের মনেরও পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের সেই প্রচণ্ড ক্ষোভ, উত্তাপ, উন্মত্ত হিংস্রতার কিছুই নেই আর। হাসিমুখে তারা হাত ধরাধরি করে প্লাটফর্মে নেমে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেন চা পানের উদ্দেশ্যে। সময়ান্তরে চরিত্র দুটির পরিবর্তন দেখিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে ক্রোধ, রোষ, ঘৃণা, দাহ মুছে যায়। এগুলো মানুষের ক্ষণিকের আবেগ, আসল সত্য হল সহৃদয়তা, মিত্রতা, মানুষে-মানুষে ঐক্য।

ছয়ের দশকে লিখিত 'হিন্দু-মুসলমান' মনোজ বসুর দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটি গল্প। গল্পের পটভূমি খুলনা জেলার খালবনা গ্রাম। দেশভাগের কিছু পূর্ববর্তী ঘটনা অবলম্বনে গল্পের আখ্যান নির্মিত হয়েছে। দেশভাগের প্রাক্কালে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্তি হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মানুষের জীবনের নানা সমস্যা গল্পের পট রচনা করেছে। কেউ জানে না খুলনা পাকিস্তানের নাকি হিন্দুস্থানের। গভীর রাতে চলে বৈঠক হিন্দুদের তরফে পূর্ণচন্দ্র সমাদ্দারের বাড়িতে, মুসলিমদের পক্ষে খোরদেশ খাঁর দলিচ ঘরে। চলতে থাকে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার পূর্ব প্রস্তুতি। পরিণত মানুষদের মনে যখন সন্দেহ অবিশ্বাসের বাতাবরণ তখন এর বিপরীতে লেখক দুটি শিশু চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন পূর্ণ সমাদ্দারের ছেলে নন্তু ও খোরশেদ খাঁর মেয়ে হাসিনা। এই দুই নিষ্পাপ শিশুর কাছে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই আতঙ্কের ঠিক বাঘ ও কুমীরের মতো। অথচ হিন্দু ও মুসলিম কী? তা তাদের অজানা। তারা কেউই হিন্দু, মুসলমান কেমন তা জানে না। কেউ দেখে নি। তাই তাদের চাওয়া— হিন্দু, মুসলমান যেন কভু দেখতে না হয়। অবোধ দুটি গ্রাম্য বালক বালিকার মতো লেখকও চান না হিন্দু ও মুসলমানের পৃথকীকরণ। দেখতে চান না হিন্দু ও মুসলমানের নির্মম, বীভৎস সংহারক রূপ। তাই গল্প মধ্যে মানবতার প্রতিমূর্তি দুই শিশুর প্রসঙ্গ এনে লেখক অনৈক্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকারান্তরে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সপক্ষে কথা বলেছেন।

মনোজ বসুর 'হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা' গল্পটি তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ। গল্পের চরিত্র বিপিন রাজনৈতিক কর্মী। সে রাজদ্রোহের অপরাধে দু'বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসে দেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিবাদে তার চিরকালের চেনা গ্রামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, জাতিতে জাতিতে হিংসা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। মানুষের চিরকালের একত্র যাপন মলীন, কালিমালিপ্ত। গ্রামে ফিরে যাবার পথে খেয়া ঘাটে এসে দেখে ধর্মের ভিত্তিতে মাঝিদের ঘাট আলাদা হয়ে গেছে। নৌকা থেকেই দেখতে পায় তাঁর স্বপ্নের গ্রাম যেখানে হিন্দু মুসলিমদের সহাবস্থান ছিল তা সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস আগুনে জ্বলছে। পরিবেশ কতটা ভয়ের আতঙ্কে তা মাঝির কথায় স্পষ্ট হয়—

> "ওপারে মোছলমান, এপারে হিন্দুরা পিরথিমে আর নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা থাকলো না, বাবু।"[৩]

সাম্প্রদায়িকতার চরম নিকৃষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হয় যখন বিপিন অতি সন্তর্পণে গ্রামে পৌঁছানোর পর তাঁরই পুত্রের কাছে ভুলবশত শত্রু রূপে চিহ্নিত হয় এবং পুত্রের ছুঁড়ে দেওয়া ইঁটের আঘাতে আহত হয় যদিও পরমুহূর্তে দেখা যায় বিপিনের পুত্র সুকুমার অপরাধ বোধে, গ্লানিতে পিতার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। চূড়ান্ত অস্বস্তিকর মুহূর্তে নিরদ তাঁকে প্রবোধ দেয়—

> "আঁধারে বোঝা যায় না, চিনতে পারলে কি মারতিস।"[৪]

বিপিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সর্বোত্তম আশাবাদ—

> "হ্যাঁ, পুবে ফর্সা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐ সব পোড়া ঘর-বাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।"[৫]

বিপিনের মত এই আশাবাদ আসলে লেখকেরও। তিনিও চান এমন এক নতুন সকালের আগমন। যে সকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকেই শুভচেতনায় জেগে উঠবে সম্প্রীতির লক্ষ্যে।

লেখকের 'বলিদান' গল্পটিও মানবিক অনুভবে সমৃদ্ধ। গল্পে আছে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও জয়নাল শেখ দুই বাল্যবন্ধুর স্মৃতিচারণ। একদা একই গ্রামে শৈশব, যৌবন অতিবাহিত হলেও দেশভাগ তাঁদের আলাদা করেছে। ধর্ম আলাদা হওয়ার কারণে দেশত্যাগে বাধ্য হয় নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। ছেড়ে আসা দেশে পুরোনো বন্ধু জয়নাল শেখের কাছে মামার সম্পত্তি বিক্রয় সূত্রে আবার দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। শৈশবের স্মৃতিচারণে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, ঐক্য ও মিলনের নানান ঘটনা উঠে আসে। জানা যায় হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ, বিরোধ-সংঘাত ছিল ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধের অভাব ছিল না। স্মৃতিচারণার এক পর্যায়ে দেশভাগের তুলনা হিসেবে উঠে আসে শৈশবের এক কালী পুজোর রাতের মহিষ বলির প্রসঙ্গ। নিত্যানন্দের মনে হয় বলি দিয়ে অসহায় মহিষটির ধড়-মুণ্ড যেমন আলাদা করে দেওয়া হয় তেমনি অখণ্ড ভারতবর্ষকেও বলি দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান যেন সেই পৃথক হয়ে যাওয়া ধড় ও মুণ্ড। নিত্যানন্দের স্মৃতিচারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা যেমন এসেছে তেমনি তার বিপরীতে মহিষের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুর সঙ্গে তুলনাত্মকভাবে বিভাগ পরবর্তী মানুষের যন্ত্রণার কথাও উঠে এসেছে। এই বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক দেশভাগ তথা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরোধিতা করে প্রকারান্তরে সম্প্রীতির মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন।

মনোজ বসুর 'সীমান্ত' গল্পটিতেও দেখা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইসমাইলের একমাত্র সন্তান রমজান নিহত হয়। যা তার মনে ধর্মীয় বিদ্বেষের আগুন জালিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় তথাকথিত দুষ্মন যদু রায়ের বিধবা মেয়ে সহায় স্বম্বলহীন হয়ে ইসমাইলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের মধ্যে পূর্বেকার স্নেহ ভালোবাসার দাদু নাতনীর সম্পর্কের অধিকারে কিন্তু দেশভাগ পরবর্তীতে সেই সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের ধর্মীয়

পরিচয়। তাই ইসমাইল আশ্রয়-প্রার্থী মঞ্জুলাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। যেহেতু মঞ্জুলা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাই সে কারণে অকারণে মেয়েটির প্রতি রূঢ় আচরণ করে কিন্তু ইসমাইলের এহেন আচরণের পরিবর্তন ঘটে যায় যখন রফিক মিঞা মঞ্জুলাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করার কথা বলে। তৎক্ষণাৎ ইসমাইলের স্ত্রী কামরন তাঁর জমানো টাকা দিয়ে মঞ্জুলাকে হিন্দুস্থানের ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়, ইসমাইলও খবর পেয়ে ছুটে এসে বহুকালের সঞ্চিত মোহর ভাড় যা সে জমিয়েছিল মৃত সন্তানের জন্য তা তুলে দেয় মঞ্জুলার হাতে। তথাকথিত শত্রুর মেয়ে ও ভিন্ন একটি জাতির মেয়ের হাতে মোহর ভাড় তুলে দিতে ইসমাইল একটুও ইতস্তত করেনা বরং মঞ্জুর কেউ নেই সে খাবে কি? থাকবে কোথায়? এই চিন্তা তাকে আকুল করে তোলে অর্থাৎ দেখা গেল যে ইসমাইল মঞ্জুলাকে আশ্রয় দিতে চায়নি সময়ে অসময়ে অনেক কটু কথা বলেছে সেই রুক্ষ কঠিন ইসমাইলের মনের অন্তঃস্থলে ছিল এই স্নেহের অবারিত ধারা। সে ধারাকে বাঁধতে পারেনি কোনো ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ।

লেখকের 'এপার-ওপার' গল্পটিও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানবতার গল্প। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের কথা রয়েছে গল্প জুড়ে। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম হত্যা ও মসজিদ ধ্বংস করার প্রতিবাদে হিমাংশুর গ্রামেও দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে শুরু হয় মুসলিম কর্তৃক হিন্দু-নিধন যজ্ঞ। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয় সমস্ত হিন্দুদের। সমগ্র হিন্দু পাড়া এক লহমায় চলে আসে মুসলিমদের দখলে। দাঙ্গার বীভৎসতায় সর্বস্ব হারিয়ে, নিঃস্ব হয়ে হিমাংশু তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে আসে ভারতবর্ষে, তাঁর স্ত্রী আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়। চার বছর পর জমিজমার বন্দোবস্ত করতে যখন সে ফিরে যায় তখন তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা হয়। যাঁদের হিংস্র অত্যাচারে বাধ্য হয়েছিল দেশত্যাগে তাঁদেরই আদর আপ্যায়নে আন্তরিকতায় সে মুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে সাম্প্রদায়িক হিংসা, হানাহানি-বিবাদ-বিরোধ আসলে ক্ষণস্থায়ী। আসল সত্য হল মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা।

মনোজ বসুর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা গল্পগুলোতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে রক্তাক্ত হওয়া, একসময়ের চেনা মানুষ কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়ে এক রক্তাক্ত-ভয়ঙ্কর ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে তা যেমন উঠে এসেছে তেমনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাও উচ্চারিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, সহানুভূতি। গল্পগুলোতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ হানাহানির হিংস্র জান্তব রূপ প্রকাশিত হলেও তা সাময়িক, শেষ পর্যন্ত মানুষ একে অপরের প্রতি বিশ্বাস-ভরসা-ভালোবাসা ও সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে পেয়েছে। আমাদের আলোচিত প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের পরিণতিতে মানবিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ দ্বন্দ্ব সরে গিয়ে মানুষ আবার তাঁর মানবিক ধর্মে মায়া-মমতা প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে। আসলে শিল্পী মনোজ বসুর কাঙ্ক্ষিত ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ এক শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর মানবসমাজ—এই আশাবাদ আলোচিত গল্পগুলোর মধ্যে বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, মনোজ। পৃথিবী কা'দের ও অন্যান্য গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ– ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২।

২. বসু, মনোজ। দিল্লী অনেক দূর। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৩।

৩. বসু, মনোজ। দুঃখ-নিশার শেষে। বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ – ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৯।

৪. তদেব, পৃ. ৭৯।

৫. তদেব, পৃ. ৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চৌধুরী, ভূদেব (সম্পাদিত)। মনোজ বসুর গল্পসমগ্র (উত্তরপর্ব)। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ–১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

২. চৌধুরী, ভূদেব (সম্পাদিত)। মনোজ বসুর গল্পসমগ্র (আদিপর্ব)। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ–১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

৩. চৌধুরী, ভূদেব (সম্পাদিত)। মনোজ বসুর গল্পসমগ্র (মধ্যপর্ব)। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ–১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৪. বসু, মনোজ। দুঃখ-নিশার শেষে। বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ–১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৫. বসু, মনোজ। খদ্যোত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ–১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

৬. বসু, মনোজ। দিল্লী অনেক দূর। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৭. বসু, মনোজ। পৃথিবী কা'দের ও অন্যান্য গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ–১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।